

কুরবানীর বিধান

বিভাগ/অধ্যায়ঃ কুরবানির বিধিবিধানের বিস্তারিত

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আবদুল হামীদ ফাইযী

এই দশ দিনের অযীফাহ

এই দশ দিনকে সামনে পাওয়া বান্দার জন্য আল্লাহর তরফ হতে এক মহা অনুগ্রহ। মুত্তাকী ও নেক বান্দাগণই এই দিনগুলির যথার্থ কদর করে থাকেন। প্রতি মুসলিমের উচিত, এই সম্পদের কদর করা, এই সুবর্ণ সুযোগকে হেলায় হারিয়ে না দেওয়া এবং যত্নের সাথে বিভিন্ন ইবাদত ও আনুগত্যের মাধ্যমে এই দিনগুলিকে অতিবাহিত করা।

এই দিনগুলিতে পালনীয় বড় বড় নেক আমল রয়েছে। মুসলিম সেই আমলসমূহের সাহায্যে বড় পুণ্যের অধিকারী হতে পারে। যেমনঃ-

১। রোযা পালনঃ

যুল্ হাজ্জের প্রথম নয়দিনে রোযা পালন করা মুসলিমের জন্য উত্তম। কারণ, নাবী কারীম (সা.) এই দিনগুলিতে নেক আমল করার জন্য সকলকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। আর রোযা উত্তম আমলসমূহের অন্যতম; যা আল্লাহ পাক নিজের জন্য মনোনীত করেছেন। যেমন হাদীসে কুদসীতে বলা হয়েছে, আল্লাহ বলেন, “আদম সন্তানের প্রত্যেক কাজ তার নিজের জন্য, কিন্তু রোযা আমারই জন্য এবং আমি নিজে তার প্রতিদান দেব।”[1]

প্রিয় নবী (সা.)ও এই নয় দিনে রোযা পালন করতেন। তাঁর পত্নী (হাফসাহ রাঃ) বলেন, “নবী (সা.) যুল্ হাজ্জের নয় দিন, আশুরার দিন এবং প্রত্যেক মাসের তিন দিন; মাসের প্রথম সোমবার এবং দুই বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন।”[2]

ইমাম বাইহাকী (রহ.) ‘ফাযায়েলুল আওকাত’ এ বলেন, এই হাদীসটি আয়েশা (রাঃ) এর ঐ হাদীস অপেক্ষা উত্তম যাতে তিনি বলেন, ‘আমি রসূল (সা.)-কে (যুল্ হাজ্জের) দশ দিনে কখনো রোযা রাখতে দেখিনি।’[3] কারণ, এ হাদীসটি ঘটনসূচক এবং তা আয়েশার ঐ অঘটনসূচক হাদীস হতে উত্তম। আর মুহাদ্দিসীনদের একটি নীতি এই যে, যখন ঘটনসূচক ও অঘটনসূচক দু’টি হাদীস পরস্পর-বিরোধী হয় তখন সমন্বয় সাধনের অন্যান্য উপায় না থাকলে ঘটনসূচক হাদীসটিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। কারণ কেউ যদি কিছু ঘটতে না দেখে তবে তার অর্থ এই নয় যে, তা ঘটেই নি। তাই যে ঘটতে দেখেছে তার কথাটিকে ঘটনার প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করা হয়।

মোট কথা, যুল্ হাজ্জ মাসের এই নয় দিনে রোযা রাখা মুস্তাহাব। ইমাম নববী (রহ) বলেন, ‘ঐ দিনগুলিতে রোযা রাখা পাকা মুস্তাহাব।’[4]

যদি কেউ যুল্ হাজ্জের প্রথম তারীখ থেকে রোযা রাখতে সক্ষম না হয়, তাহলে অন্ততঃপক্ষে তাকে এ মাসের ৯ম তারীখে রোযা রাখতে অবশ্যই চেষ্টা করা উচিত। যেহেতু রসূল (সা.) তার গুরুত্ব ও ফযীলতের উপর উম্মতকে বিশেষভাবে অবহিত করে রোযা রাখতে অনুপ্রাণিত করেছেন। তিনি বলেছেন, “আরাফার দিন রোযা অতীত এক বছর ও আগামী এক বছরের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে।”[5]

পূর্ব ও পশ্চিমের দেশগুলিতে আরাফার দিন ১/২ দিন পরে হয়। সুতরাং ঐ সকল দেশের লোকেরা কোন দিন আরাফার রোযা রাখবে? এ নিয়ে অবশ্য মতভেদ রয়েছে। অতএব তারা যদি উক্ত নয় দিনই রোযা পালন করে, তাহলে উত্তম হয়। নচেৎ রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশ এবং আল্লাহর নিচের আকাশে অবতরণ যেমন একই সময় সম্ভব নয়, অনুরূপ ঈদ ও আরাফা ইত্যাদির দিন একই দিন হওয়া জরুরী নয়। সকলেই সওয়াবের অধিকারী হবে ইন শাআল্লাহ।

২। তাকবীর পাঠঃ-

এই দিনগুলিতে তাকবীর, তাহমীদ, তাহলীল ও তাসবীহ পাঠ করা সুন্নাত এবং তা উচ্চস্বরে মসজিদে, ঘরে, পথে ও বাজারে এবং সেই সকল স্থানে যেখানে আল্লাহর যিকর বৈধ - পাঠ করা মুস্তাহাব। এই তাকবীর পুরুষরা উচ্চস্বরে বলবে এবং মহিলারা চুপেচুপে। যার মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত প্রচারিত হবে এবং ঘোষিত হবে তাঁর অনুপম তা'যীম। এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন,

(لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ)

অর্থাৎ, “যাতে ওরা কল্যাণ লাভ করে এবং নির্দিষ্ট জানা দিনগুলিতে আল্লাহর নাম স্মরণ করে- পশু হতে তিনি তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দান করেছেন তার উপর --।”[6]

অধিকাংশ ব্যাখ্যাতার মতে ‘নির্দিষ্ট জানা দিন’ অর্থাৎ যুলহাজ্জের প্রথম দশ দিন। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, ‘নির্দিষ্ট জানা দিন’ হল (যুলহাজ্জের) দশ দিন এবং ‘নির্দিষ্ট সংখ্যক দিন’ হল তাশরীকের কয়েকটি দিন।”[7] অন্য এক বর্ণনায় তিনি বলেন, ‘নির্দিষ্ট জানা দিন’ অর্থাৎ তাশরীকের পূর্বের দিনগুলি; তারবিয়ার দিন এবং আরাফার দিন। আর ‘নির্দিষ্ট সংখ্যক দিন’ অর্থাৎ তাশরীকের দিনগুলি।

আর এই মতই ইবনে কাসীর আবু মূসা আশআরী, মুজাহিদ, ক্বাতাদাহ, আত্মা, সাঈদ বিন জুবাইর, হাসান, যাহহাক, আত্মা খুরাসানী, ইবরাহীম নাখয়ী হতে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, ‘এই মত ইমাম শাফেয়ীর। আর ইমাম আহমদ বিন হাম্বল হতে এটাই প্রসিদ্ধ।’[8]

সুতরাং এই কথার ভিত্তিতে আয়াতে উল্লেখিত আল্লাহর যিকর (স্মরণ) করার অর্থ হবে, আল্লাহ পাক যে গবাদি পশু মানুষের রুযীরূপে দান করেছেন তার উপর তাঁর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা (শুকরিয়া আদায় করা) এবং এতে তাকবীর ও কুরবানী যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম নেওয়া শামিল হবে। তাই আল্লাহর যিকর বলতে কেবল যবেহকালে আল্লাহর নাম স্মরণ করাই নয়। কারণ হজ্জে কুরবানী যবেহ করার দিন ঈদের দিন হতেই শুরু হয়।[9]

এই দিনগুলিতে পঠনীয় তাকবীর নিম্নরূপঃ-

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

‘আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লা-হিল হামদ।

এ ছাড়া অন্যান্যরূপেও তাকবীর পাঠ করার কথা পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের জানা মতে রসূল (সা.) হতে কোন নির্দিষ্টরূপ তাকবীর সহীহভাবে বর্ণিত হয়নি। যা কিছু এ মর্মে বর্ণিত হয়েছে সবই সাহাবাগণের আমল।[10]

ইমাম সানআনী (রহ.) বলেন, ‘তাকবীরের বহু ধরন ও রূপ আছে, বহু ইমামগণও কিছু কিছুকে উত্তম মনে করেছেন। যা হতে বুঝা যায় যে, এ বিষয়ে প্রশস্ততা আছে। আর আয়াতের সাধারণ বর্ণনা এটাই সমর্থন করে।’[11]

কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, তাকবীর এ যুগে প্রত্যাখ্যাত সুন্নতের মধ্যে পরিগণিত হয়েছে। বিশেষ করে প্রথম দশ দিনে তো অল্প কিছু মানুষ ব্যতীত আর কারো নিকট হতে তাকবীর শুনাই যায় না। তাই উচ্চস্বরে তাকবীর পড়া উচিত; যাতে সুন্নাহ জীবিত হয় এবং উদাসীনদের মনে সতর্কতা আসে।

পক্ষান্তরে এ কথা প্রমাণিত যে, ইবনে উমার (রা.) এবং আবু হুরাইরা (রা.) এই দশ দিন বাজারে বের হতেন এবং (উচ্চস্বরে) তাকবীর পড়তেন। আর লোকেরাও তাঁদের তাকবীরের সাথে তাকবীর পাঠ করত।[12] অর্থাৎ, তাঁদের তাকবীর পড়া শুনে লোকেরা তাকবীর পড়তে হয় একথা স্মরণ করত এবং প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক তাকবীর পাঠ করত। তাঁরা একত্রিতভাবে একই সুরে সমস্বরে তাকবীর পড়তেন না।

এই দিনগুলিতে সাধারণ তাকবীর ও তাসবীহ আদি যে কোন সময়ে দিনে বা রাতে অনির্দিষ্টভাবে ঈদের নামায পর্যন্ত পাঠ করতে হয়। আর নির্দিষ্ট তাকবীর যা ফরয নামাযের জামাআতের পর (একাকী) পাঠ করা হয় আর তা অহাজীদের জন্য আরাফার (৯ম যুলহাজ্জ) দিনের ফজর থেকে এবং মক্কা শরীফে হাজীদের জন্য কুরবানীর দিনের যোহর থেকে শুরু হয় এবং তাশরীকের শেষ দিনের (১৩ই যুল হাজ্জের) আসর পর্যন্ত চলতে থাকে।

উল্লেখ্য যে, বিলীন বা বিলীয়মান কোন সুন্নাহকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করায় আল্লাহর নিকট মহা প্রতিদান ও বৃহত্তর সওয়াব রয়েছে। প্রিয় নবী (সা.) বলেন, “যে ব্যক্তি আমার সুন্নতের মধ্যে কোন সুন্নাহ জীবিত করে যা আমার পরবর্তীকালে মৃত হয়ে পড়েছিল, তার জন্য সেই ব্যক্তির সমপরিমাণ সওয়াব হবে, যে তার উপর আমল করে এবং তাদের কারো সওয়াব কিছুও কম করা হবে না।”[13]

৩। হাজ্জ ও উমরাহ আদায় করাঃ-

এই দশ দিনের মধ্যে হাজ্জ আদায় করা সর্বোত্তম আমলসমূহের অন্যতম। অতএব যাকে আল্লাহপাক তাঁর গৃহের হাজ্জ করার তওফীক দান করেছেন এবং যে যথার্থরূপে হাজ্জ পালন করতে প্রয়াসী হয়, সে ইনশাআল্লাহ রসূলুল্লাহ (সা.) এর এই বাণীতে তার মহাভাগ থাকবে, “মঞ্জুরকৃত হাজ্জের প্রতিদান জান্নাত ব্যতীত আর কিছু নয়।”

৪। কুরবানী করাঃ-

এই দশ দিনের করণীয় আল্লাহর নৈকট্যদানকারী আমলের মধ্যে কুরবানী করা অন্যতম। যার বিশদ বিবরণ পরে দেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ।

৫। অন্যান্য নেক ও সৎকার্যে অধিক মনোযোগ দেওয়াঃ-

এই দিনগুলিতে নেক আমল আল্লাহর নিকট অধিকতর প্রিয়। আর তা হলে অবশ্যই এই দিনসমূহের কৃত আমলের মান ও মর্যাদা তাঁর নিকট অধিক। তাই মুসলিমের উচিত, যদি হাজ্জ করা তার সামর্থ্য ও সাধ্য না কুলায় তবে এই মূল্যবান সময়গুলিকে যেন সৎকার্য, আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য; নফল নামায, তিলাওয়াত, যিকর, দুআ, দান, পিতামাতার অধিক খিদমত, আত্মীয়তা, সৎকার্যের আদেশ ও অসৎকার্যে বাধা দান, ইত্যাদি দ্বারা আবাদ করে। অন্ততঃপক্ষে ঐ দিনগুলিতে আল্লাহর রসূল (সা.)-এর এই কথা স্মরণ করা উচিত, “যে ব্যক্তি

ফজরের নামায জামাআতে আদায় করে অতঃপর সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহর যিকরে (তাসবীহ, তাহলীল, তিলাওয়াত, ইল্ম বা দ্বীনী আলোচনায়) বসে এবং তারপর দুই রাকআত নামায পড়ে তবে এক হাজ্জ ও উমরাহর সমপরিমাণ তার সওয়াব লাভ হবে।”[14]

আল্লাহর তরফ হতে বান্দার জন্য এটা এক সুবৃহৎ অনুগ্রহ এবং অতিশয় কল্যাণ। যার অনুগ্রহ ও করুণার শেষ নেই, যা চিন্তা ও ধারণায় কল্পনা করা যায় না। যাতে অনুমতিরও কোন স্থান নেই। যেহেতু তিনি পুরস্কর্তা ও অনুগ্রাহী। তাঁর ইচ্ছামত তিনি যা দিয়ে, যাকে ইচ্ছা, যে কোন আমলের মাধ্যমে ইচ্ছা পুরস্কৃত ও অনুগ্রহীত করে থাকেন। তাঁর ইচ্ছা ও আদেশ রদ করার কেউ নেই এবং কেউ তাঁর মঙ্গল ও অনুগ্রহকে রহিত করতে পারে না।

৬। বিশুদ্ধ তাওবাহ করাঃ-

এই দশ দিনে মুসলিমদের জরুরী কর্তব্যের মধ্যে আল্লাহর নিকট তাওবাহ করা, তাঁর প্রতি প্রত্যাবর্তন করা, কৃতপাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং পাপ ও অবাধ্যতা থেকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিনিবৃত্ত হওয়াও উল্লেখ্য। তাওবাহ হল- আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তন করা; যে গুণ্ড অথবা প্রকাশ্য জিনিস আল্লাহ ঘৃণা করেন সেই জিনিস হতে, যা তিনি পছন্দ করেন ও ভালোবাসেন তার প্রতি, বিগত (পাপের) উপর লাঞ্ছনা ও অনুশোচনা প্রকাশ করে, বর্তমানে তা প্রত্যাখ্যান করে এবং পুনরপি তার প্রতি না ফেরার দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে - ফিরে আসার নাম।

মুসলিমের জন্য ওয়াজিব; যখন সে পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে অথবা অকস্মাৎ কোন পাপ করে বসে তখন শীঘ্রতার সাথে তাওবাহর মাধ্যমে আল্লাহর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করা এবং এ কাজে গয়ংগাচ্ছ অথবা ডিলেমি না করা। কারণ, প্রথমতঃ সে জানে না যে, তাকে কোন ঘড়িতে মরতে হবে। দ্বিতীয়তঃ এক পাপ অপর পাপকে আকর্ষণ করে। তাই সতক্ষর তাওবাহ না করলে হয়তো বা পাপের বোঝা নিয়েই মরতে হয় অথবা পাপের বোঝা আরো ভারি হতে থাকে।

গুরুত্ব ও মর্যাদাপূর্ণ সময়কালে তাওবাহর বড় গুণ থাকে। যেহেতু ঐ সময়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মন আনুগত্য-প্রবণ থাকে এবং সৎকাজের প্রতি হৃদয় আকৃষ্যমাণ হয়। তখন হৃদয় অন্যায় ও পাপকে সর্বীকার করতে চায় এবং কৃত পাপের উপর বড় অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়।

যদিও তাওবাহ করা এক প্রতিনিয়ত ওয়াজিব। তবুও যেহেতু তাওবাহ করা আমল কবুল হওয়ার এবং আল্লাহর ক্ষমা ও অনুগ্রহ লাভ করার হেতুসমূহের অন্যতম তথা পাপ দূরীকরণ ও মোচন হওয়ার কারণ; আবার ইবাদত আল্লাহর সান্নিধ্য ও ভালোবাসা লাভের হেতু সেহেতু মুসলিম যখন বিশুদ্ধ তাওবাহর সাথে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে মর্যাদাপূর্ণ আমল করে থাকে, তখন তার উভয়বিদ অতিরিক্ত কল্যাণ লাভ হয়; যা সফলতার প্রতি ঈঙ্গিত করবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ পাক বলেন,

(فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَغَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তাওবাহ করে ও সৎকাজ করে, সে তো অচিরে সফলকাম হবে।” (সূরা ক্বাসাস ৬৭ আয়াত)

মুসলিম তাওবাহ করবে পুরুষের মত। সবামী সংসর্গ ত্যাগ করার উপর প্রসব বেদনাদগ্ধা নারীর মত তাওবাহ করবে না। বরং তাওবাহ করে তাতে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। পক্ষান্তরে পাপ যদি সংসর্গ ও পরিবেশ-দোষে হয়, তাহলে সেই সংসর্গ ও পরিবেশ ত্যাগ করে সুন্দর নির্মল ইসলামী পরিবেশ গ্রহণ করবে এবং সংলোকদের সংসর্গ গ্রহণ

করে সৎকার্যে অবিচল থাকবে।

মুসলিমের উচিত, কল্যাণময় এই শ্রেণীর মৌসমের প্রতি প্রলুব্ধ হওয়া। কারণ, তা ক্ষণস্থায়ী। নিজের সংকট মুহূর্তে সাহায্য লাভের জন্য নেক আমলের পাথেয় সংগ্রহ করা প্রত্যেক মুমিনের কর্তব্য। যেহেতু পৃথিবীতে অবস্থান কাল অতি অল্প। কুচের সময় আসন্ন, পথ শঙ্কাপূর্ণ, যেথায় প্রবঞ্চনার আশঙ্কাই অধিক এবং বিপদের ভয় বড়। আর নিশ্চয় আল্লাহ পাক সূক্ষ্ম ও সর্বদ্রষ্টা এবং তাঁরই নিকট সকলের প্রত্যাবর্তনস্থল। আর “যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ সৎকাজ করবে সে তা দর্শন করবে এবং যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ অসৎকাজ করবে সে তাও দর্শন করবে।”[15]

ফুটনোট

- [1] (বুখারী ১৮০৫, মুসলিম ১১৫১নং)
- [2] (সহীহ আবু দাউদ ২১২৯নং, নাসাঈ)
- [3] (মুসলিম ১১৭৬নং)
- [4] (শারহুন নববী ৮/৩২০)
- [5] (মুসলিম ১৬৬২নং)
- [6] (সূরা হাজ্জ ২৮ আয়াত)
- [7] (বুখারী ২/৪৫৭)
- [8] (তাফসীর ইবনে কাসীর, আযওয়াউল বায়ান ৫/৪৯৭)
- [9] (ফতোয়া ইবনে তাইমিয়াহ ২৪/২২৫)
- [10] (ইরওয়াউল গালীল ৩/১২৫)
- [11] (সুবুলুস সালাম ২/১২৫)
- [12] (বুখারী)
- [13] (তিরমিযী)

[14] (তিরমিযী)

[15] (সূরা যিলযাল ৭-৮ আয়াত)

Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=5058>

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন